Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation After 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

জোট-নিরপেক্ষ বা নির্জোট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ব ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা এনেছিল। এসময় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ইতিহাসের প্রধান শক্তি ছিল ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি। যুদ্ধের পর ইউরোপীয় শক্তিগুলির মর্যাদা আগের মতো ছিল না। ইতালি ও জার্মানি পরাজিত হয়েছিল, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জয় লাভ করলেও অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এদের উপনিবেশ গুলি স্বাধীনতা লাভ করেছিল।ফলে এশিয়া ও আফ্রিকায় অনেক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। সদ্য এই স্বাধীনতা প্রাপ্ত এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব গড়ে উঠেছিল। এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সব দিক দিয়েই ছিল দুর্বল। এই সকল দেশগুলি যখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত ছিল উন্নত দেশগুলি ঠাণ্ডা লড়াইয়ে মত্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে বিশ্বরাজনীতিতে দ্বিমেরুকরণ হয়েছিল। একদিকে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক দেশগুলির শিবির, অন্যদিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শিবির। এই দুই শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছিল ঠাণ্ডা লড়াই। দুই শিবিরই ভেবেছিল সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত এই দেশগুলিকে নিজেদের দিকে এনে নিজেদের শক্তি বাড়াবে। কিন্তু এই সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই দেশগুলি কোন শিবিরেই যোগদান করেনি। তারা এক নতুন স্বতন্ত্র পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করেছিল, সেই নীতিকে বলা হয় জোটনিরপেক্ষ নীতি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বিশ্বব্যাপী যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তাকে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বলা হয়। অনেকের মতে এই আন্দোলন ছিল আসলে ঠাণ্ডা লড়াই এর বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ।

জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান রুপকার ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তিনি ১৯৪৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় বেতারে জোট-নিরপেক্ষতার কথা প্রথম বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল ভারত কোন রকম গোষ্ঠী রাজনীতিতে অংশ নেবে না, বরং সব ধরনের গোষ্ঠী রাজনীতি থেকে ভারত দূরে থাকবে। তাঁর মনে হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সমগ্র

বিশ্ব যে দুটি শক্তি শিবিরে বিভক্ত হয়েছিল তাতে ভারত সহ কোন সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের যোগ দেওয়া উচিৎ না। তিনি স্বাধীন স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতি অর্থাৎ জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। নেহরুর মতে জোট-নিরপেক্ষতার অর্থ বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকা নয় বরং নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া এবং তাকে মর্যাদা দিতে উন্নত বিশ্বকে বাধ্য করা। তাঁর মতে কোন একটি দেশের একক প্রচেষ্টায় তা করা সম্ভব নয়। সে জন্য জোট জোটবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাঁর নেতৃত্বে জোটনিরপেক্ষতা নীতি ক্রমশ আলাদা এক রাষ্ট্রজোটে পরিণত হয়েছিল।

ভারতের মতো সদ্য স্বাধীন হওয়া এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলি তাদের স্বাধীনতা কে যে কোন মুল্যে রক্ষা করতে এবং সার্বিক বিকাশকে তরান্বিত করার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন বা সোভিয়েত শিবিরে যোগ দেয়নি। তারা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলন কেবলমাত্র এশিয়া আফ্রিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, লাতিন আমেরিকা এমনকি ইউরোপের যুগোশ্লাভিয়া এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। টিটোর নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ার নির্দেশ মানতে ইচ্ছুক ছিল না, তিনি ইঙ্গ-মার্কিন জোটেও যোগ দেননি। তিনি যোগ দেন এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে ফলে এই আন্দোলন তিনটি মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এই আন্দোলন কে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নেহরুর মতো মিশরের নাসের, যুগোশ্লাভিয়ার টিটো, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, ঘানার নক্রুমার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাদের নেতৃত্বে এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এক বিশ্বজোড়া আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি হিসাবে জোট-নিরপেক্ষতা নীতিকে মেনে নেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালে এপ্রিল মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ভারত ভ্রমনে আসেন, তখন থেকে ভারত চীন সম্পর্ক নতুন মোড় নিয়েছিল। অবশ্য চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বরাবরই ভাল ছিল। ১৯৫৪ সালের ২৯শে এপ্রিল দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাঁচটি নীতি গ্রহণ করা হয়। যাকে পঞ্চশীল বলা হয়। এই পঞ্চশীল বা নীতি হল –

পঞ্চশীল নীতি

(১) পরস্পরের ভৌমিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। অর্থাৎ চীন এবং ভারত কেউই কারোর ভৌমিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমিকতার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।
(২) পারস্পারিক অনাক্রমণ।
(৩) অন্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।
(৪) সাম্য ও পারস্পারিক উপকার।
(৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

ভারতের বিদেশনীতির বহিঃপ্রকাশ ছিল এই পঞ্চশীল নীতি। নেহরুর মতে ভারতের অতীত জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এই নীতিটি জড়িত। এই পঞ্চশীল নীতিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ভারত

ও চীনের আন্তরিকতার অভাব অন্তত সেই মুহূর্তে ছিল না। ১৯৫৪-১৯৫৭ সালের মধ্যে চীনা প্রধানমন্ত্রী ছউ-এন-লাই চার বার ভারত ভ্রমনে আসেন। চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের কোন দ্বিধা ছিল না।

নেহরু জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে কলম্বোতে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন কে এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রকৃত সূচনা বলা চলে। এই সম্মেলনেই প্রথমবার 'জোট-নিরপেক্ষ' কথাটি ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে এশিয়ার ১৪ টি রাষ্ট্র নতুন দিল্লীতে সমবেত হয়েছিল। তারা পারস্পারিক ঐক্যকে শক্তিশালী করা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণ কে প্রতিরোধ করা এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কে পরিচালনা করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

গোষ্ঠী হিসাবে জোটনিরপেক্ষতা অনুসরণের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল ১৯৫৫ সালের ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরের সম্মেলন। এই সম্মেলন জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। এশিয়া আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের ২৯ টি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলি শস্ত্র মিদযোযো ছিলেন এই সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা। এই সম্মেলনে আর যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব অংশ নিয়েছিলেন তারা হলেন চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন- লাই, মিশরের প্রধানমন্ত্রী নাসের প্রমুখ। পাকিস্তান, ইরাক, ফিলিপাইন, তুরস্ক, থাইল্যান্ড ইত্যাদি পশ্চিমি শিবিরভুক্ত ৬ টি দেশ এই সম্মেলনে অংশ নিয়ে এই সম্মেলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছিল। এই সম্মেলনে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, এশিয়া আফ্রিকা থেকে বর্ণবিদ্বেষ দূর করা, আনবিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ও ব্যাবহার নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে দশটি নীতি অনুসরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেগুলি হলো –

বান্দুং সম্মেলন

(১) মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা করা ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন করা।

(২) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখা।

(৩) সকল বর্ণ ও জাতির সমান অধিকারকে স্বীকৃত দেওয়া।

(৪) অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

(৫) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে একক বা যৌথভাবে সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া।

(৬)এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি না করা।

(৭)প্রতিটি দেশ আগ্রাসন বা ভীতি প্রদর্শন থেকে দূরে থাকবে, যারা করবে তাদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হবে।

(৮) শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করা হবে।

(৯) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রতি নজর দেওয়া হবে, এবং

(১০) ন্যায়-নীতি ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।

অনেকেই মনে করেন বান্দুং সম্মেলন থেকেই প্রকৃত অর্থে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নেহরু, টিটো, নাসের, সুকর্ণ প্রমুখ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতারা জাতিপুঞ্জের সাধারন সভার অধিবেশনে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির একটি সম্মেলনের কথা চিন্তাভাবনা শুরু করেন। সেই চিন্তাভাবনার সূত্র ধরে ১৯৬১ সালের জুন মাসে কায়রোতে ২১ টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মিলিত হন। এই সম্মেলনে জোটনিরপেক্ষতার পাঁচটি নীতি গৃহীত হয়- এই নীতি গুলি হলো – (১) জোট- নিরপেক্ষতা (২) কোন দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা (৩) বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা (৪) বর্ণবৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ প্রতিহত করা (৫) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করা।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির প্রথম শীর্ষসম্মেলন হয়। ২৫ টি সদস্যরাষ্ট্র এবং তিনজন পর্যবেক্ষক এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। যাদের উৎসাহে জোটনিরপেক্ষতার জন্ম হয় তারা সকলেই ছিলেন। সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল নেহরু। বেলগ্রেড সম্মেলনে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, শান্তিপূর্ণ সহবস্থান, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের অবসান, জাতি ও বর্ণ বৈষম্যের অবসান ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাবে আরো বলা হয় এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার জাতীয়মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো হবে। বড় দেশগুলি বিদেশে যে সকল স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল সেগুলি অপসারণের দাবী জানানো হয়। সব রকমের বৈষম্যের বিরুদ্ধে মূলত অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তারা সরব থাকবে। উন্নয়নশীল দেশগুলি যাতে নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়ার প্রস্তাব আনা হয়। এই সম্মেলনে যুদ্ধ ও আনবিক অস্ত্রের বিপক্ষে এবং শান্তি ও সহাবস্থানের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই সম্মেলন ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি।

বেলগ্রেড সম্মেলন

১৯৬৪ সালের ৫ই অক্টোবর কায়রো শহরে দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে যে প্রস্তাবগুলি নেওয়া হয়েছিল সেগুলি কে কার্যকর করার জন্য দ্বিতীয় সম্মেলনে উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সম্মেলনে বলা হয় শান্তি ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে হলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, ও বিশ্বের সমস্ত দেশের সার্বিক বিকাশের জন্য জোটনিরপেক্ষতার নেতারা রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন নীতি কে কার্যকর করার কথা বলেন। তারা স্বাধিকার আন্দোলনকে ব্যাপক করার জন্য এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছ থেকে যাতে কোন বাধা না আসে সে দিকে নজর দেওয়ার কথা বলেন। এই সম্মেলনে কতগুলো অঞ্চলকে Peace Zone বা শান্তির এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়। ভারত মহাসাগরে কোন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন না করার কথা বলা হয়, এর পিছনে মূল কারন হল ১৯৬১ সালে ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর স্থাপন করেছিল আমেরিকা। সামরিক তৎপরতা এই উপমহাদেশে যাতে উত্তেজনা ছড়াতে না পারে তার জন্য এই ঘোষণা করা হয়েছিল।

কায়রো সম্মেলন

জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলন এরপর ১৯৭০ সালে লুসাকা, ১৯৭৩ সালে আলজিয়ারস ১৯৭৬ সালে কলম্বো, ১৯৭৯সালে হাভানা, ১৯৮৩ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৮৩ এর দিল্লী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান হিসাবে ভারতের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিরাট দেশ ভারত শান্তি নীতি গ্রহণ করতে পেরেছিল বলেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এত সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল। জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে দুই শিবিরের (ইঙ্গ-মার্কিন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন শিবির) বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিল বলেই করিয়াতে যুদ্ধ-বিরতির পর ভারতের উপরে যুদ্ধবন্দী বিনিময় কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইন্দ-চীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম এবং ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধানেও ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাই বলা যায় জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর ক্রমশ বিশ্ব রাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।